বাংলা প্রসেনিয়ম থিয়েটার ঃ ১৭৯৫ - ১৯৪৪

বিষ্ণু বসু

স্বীকরণের শক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে কোনও চলিষ্ণু সংস্কৃতির প্রাণরহস্য। তাই লিয়েবেদেভের মতো বিদেশী যখন নতুন গড়ে ওঠা কলোনিয়াল রাজধানী কলকাতায় গড়ে তুললেন প্রতীচ্য ধাঁচের থিয়েটার, জায়মান মধ্যবিত্ত বাঙালির তাকে বরণ করে নিতে বাধেনি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কলকাতার ডুমতলায় লিয়েবেদেভ পত্তন করেছিলেন 'বেঙ্গলী' ন ামে যে থিয়েটার, তার আয়ু হয়ত বেশিদিন ছিল না, কিন্তু তার অভিঘাত থেকে উৎপন্ন তরঙ্গ আন্দোলিত হয়ে চলেছে অদ্যাবধি। তার মানে এই নয় যে 'অভিনয়' নামক বিষয়টি এবং প্রদর্শ শিল্প বাঙালির পুরোটাই ছিল অজানা। নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে অন্তত দুহাজার বছর ধরে, ভরত মুনির 'নাট্যশাস্ত্রম' এবং ভাস কালিদাস ভবভুতির উত্তরাধিকার বর্ত ায় আমাদের উপরেও ; কারও কারও মতে 'মৃচ্ছকটিক'--এর শূদ্রক ছিলেন বাঙালি, মধ্যযুগের বাংল ায় লেখা হয়েছিল বেশ কিছু মিশ্রভাষার নাটক, চৈতন্যদেব স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন একখানি পালায়, এমনকী আঠারো শতকেই ভারতচন্দ্র লিখতে শু করেছিলেন 'চণ্ডী' নাটকটী। তাছাড়া একথা বলাই যায় যে, রাজসভাকেন্দ্রিক নাট্য প্রযোজনা বিলুপ্ত হলেও সে ঐতিহ্য বেঁচে ছিল সমাজের বিবিধ ধরনের অভিনয়ের ধারার মধ্যে। যাত্রা, ঝুমুর, আলকাপ, গম্ভীরা, লেটো প্রভৃতি অজস্র ধরনের লোকনাট্য তা ধারণ করে রেখেছিল নিজস্ব শরীরে । এসব লোকজ উপকরণের সঙ্গে য়ুরোপীয় ধাঁচের থিয়েটারের সম্মিলন ঘটিয়ে লিয়েবেদেভ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। এর প্রায় অর্ধ শতক আগে কলকাতায় প্রবর্তন ঘটেছিল যে পাশ্চাত্য থিয়েটারের লিয়েবেদেভ তার অন্ধ অনুকরণ করলেন না। আঙ্গিক রাখলেন বিদেশী, নাটকও ইংরেজি থেকে নেওয়া, কিন্তু তিনি ধাঁচটা তৈরি করতে চাইলেন একেবারেই এদেশী। তাই অভিনেতা স ম্প্রদায় সংগ্রহ করলেন যাত্রার দল থেকে, অভিনেত্রীরাও এলেন হয়ত বা ঝুমুরের দল থেকে, 'কাল্পনিক সংবদল' নামের মধ্যেও রয়ে গেল কলকাতার পরিচিত 'সং', নামের শিল্পটি এবং প্রযোজনায় যুক্ত হল বিদ্যাসুন্দরের গান। প্রতীচ্য ও প্র াচ্যের মিলনে গড়ে উঠল যে আধুনিক থিয়েটার তা আমাদের সংস্কৃতির একটি সজীব ধারা হিসেবে প্রাণবান হয়ে রইল। ত াই আমরা বিস্মৃত হতে পারি না যে, এ ধারার প্রবর্তক একজন বিদেশী হলেও তিনি একান্ত আমাদের এবং তাঁর নাম গোরা সিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদভ।

অবশ্য বাংলা থিয়েটারের প্রবর্তক হিসেবে লিয়েবেদেভকে স্বীকার করতে চান না কেউ কেউ। তাঁদের মতে, পরবর্তীকালের বাংলা থিয়েটার যেহেতু গড়ে ওঠেনি তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাই তাঁকে এ মর্যাদা দেবার প্র ওঠে না। অবশ্য বক্ষ্যমান আলে াচনায় এ বিতর্কে যাওয়া হচ্ছে না কেননা তা নিয়ে রচিত হতে পারে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ । শুধু এ প্রসঙ্গে একটু স্মরণযোগ্য যে বাংলা নাট্যপ্রযোজনা বা প্রদর্শ শিল্পের সঙ্গে এই প্রথম যুক্ত হয়েছিল 'থিয়েটার' শব্দটি এবং তার গুত্বও ইতিহাসে খুব একটা কম নয়। এখনও আমরা বিষয়টি বোঝাতে 'থিয়েটার' শব্দটিই শুধু ব্যবহার করে থাকি।

-- দুই --

সে যাই হোক, লিয়েবেদেভের প্রবর্তন সত্ত্বেও কলকাতার মঞ্চনাট্য প্রয়োজনার ধারাবাহিকতা ছিল না, এ কথাও ঐতিহা সিকভাবেই সত্য। এমনকি মঞ্চ নাটক দেখার জন্য কলকাতার দর্শকদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও সাড়ে তিন দশক। ইতিমধ্যে কলকাতায় শু হয়ে গেছে নবজাগরণের নানা উল্লাস। রামমোহনের কর্মকাণ্ড তখন পৌঁছেছে সফলতায়, দেখা দিয়েছে বেশ কিছু বাংলা পত্রিকা, প্রতিষ্ঠা ঘটেছে 'হিন্দু কলেজ' নামক প্রতিষ্ঠানের। এ হেন পরিবেশে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর শুঁড়ার বাগানবাড়িতে পত্তন করলেন 'হিন্দু থিয়েটার'। সেখানে অবশ্য প্রযোজিত হল না কোন ব াংলা নাটক। 'হিন্দু থিয়েটার' নাটক মঞ্চস্থ করল ইংরেজিতে, অভিনীত হল 'উত্তরচরিত্র' থেকে কিছু অংশ এবং 'জুলিয়াস

সিজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক। এখানে লক্ষ্য করাব বিষয় হল বাংলায় প্রথম থিয়েটার করলেন একজন বিদেশী, কিন্তু কে
ানও বাঙ্গালি যখন প্রথম নাট্যপ্রযোজনায় ব্রতী হলেন তখন তাঁর অবলম্বন হল ইংরেজি ভাষা। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ধরা
পড়েছে তখনকার শিক্ষিত বাঙালির এক ধরনের বিচিত্র মানসিকতা।
'হিন্দু থিয়েটার' প্রবর্তনায় শু হল কলকাতার বাবুদের বাড়িতে থিয়েটার তথা 'বাবু থিয়েটার'। এ প্রবাহপ্রাণময় ছিল মোট
ামুটি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পযন্ত অর্থাৎ তেতাল্লিশ বছর। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খ্রিস্টব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' মঞ্চস্থ করেছিল
'নীলদর্পণ'। শু হল পেশাদার থিয়েটারের পালা। এ তিনটি পর্যায়ের বাংলা থিয়েটারের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত
হচ্ছে।
-- তিন --
১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে বাবুদের বাড়ির গুত্বপূর্ণ থিয়েটারের সংখ্যা বারো। অবশ্য নাম প
াওয়া যায় আরও কিছু খুচরো থিয়েটারের যাদের কথা এখানে ধরা যাচ্ছে না। এই বারোটি মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ
হয়েছে একত্রিশটি নাটক ও প্রহসন। এদের মধ্যে যেমন ছিল ইংরেজি নাটক ও প্রহসন, তেমনি ছিল সংস্কৃত থেকে অনূদিত ও
মৌলিক বাংলা নাটক। সংস্কৃত নাটক প্রধানত বাংলায় অনুদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। ব্যতিত্রম শুধু 'হিন্দু থিয়েটার' উত্তর
চরিতের কিছু অংশের ইংরেজিতে অভিনয়। বাংলা অনুদিত সংস্কৃত নাটকগুলো হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম', 'বিত্রমোর্বশী',
'রত্নাবলী', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' এবং 'মালতীমাধব'। দেখা যাচ্ছে লিয়েবেদভ বাঙালি দর্শকের চির মান নিয়ে যে কটাক্ষ
করেছিলেন, তা অস্বীকার করেছে এসব প্রযোজনা। ইংরেজি নাটক নির্বাচনের রীতি কিন্তু এতটা ঋজু ছিল না। এক্ষেত্রে
যেমন প্রযোজিত হতে দেখা যায় জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, মার্চেন্ট অব ভেনিস অথবা হেনরি দ্য ফোর্থের মতো
শেক্সপীয়রের ধ্রুপদী কিছু নাটক তেমনি সাহায্যকারী হিসেবে হাজির থেকেছে 'দ্যফক্স অ্যাণ্ড দ্য উলফ', 'নাথিং সুপারফ্লুয়
াস', 'লাভার্স কোয়ারেল', 'দ্য প্লাউম্যান টার্ণ' প্রভৃতির মতো প্রহসন। সমকালের সাহেব পাড়ার মঞ্চ থেকেই এসেছিল
এমন ধরনের প্রযোজনা । তাছাড়া সেকালে অভিনয়ের সময়সীমা বিস্তৃত ছিল বলে একটি বড় নাটকের সঙ্গে অভিনীত হত
ছোট একটি প্রহসন। বাংলা থিয়েটারেও এক রীতি গড়ে উঠেছিল, যার ফসল বেশ কিছু প্রহসন ও পঞ্চরং।

বাবু থিয়েটারে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তেরোটি। এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত 'বাবু বিলাস'
প্রহসনটিওপড়ছে। নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রযোজিত 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় নাট্যরূপ কে দিয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায়
না।তবু এটি মৌলিক নাটক হিসেবেই গৃহীত হতে পারে, কেননা সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত অথবা অপরের লেখা কাহিনী
থেকে রচিত নাটক মৌলিক বলেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। পরিতাপের বিষয় এ নাট্যরূপটি এসে পৌঁছায়নি উত্তর কালের হ
াতে। পৌঁছলে এটিকেই বলা হত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক এবং প্রথম বাঙালি নাটককার বলে স্বীকৃত হতেন এর লেখক।
এখানে যে তেরোটি নাটক ও প্রহসনের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে যেমন পড়ছে, 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'শর্মিষ্ঠা',
কৃষ্ণকুমারী'র মত নাটক, তেমনি রয়েছে 'একেই বলে সভ্যতা?' 'নবনাটক', 'যেমন কর্ম তেমন ফল'. 'বুঝলে কিনা' প্রভৃতি
প্রহসন। এ সকল প্রযোজনার সূত্রেই বাংলা থিয়েটারে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মধূসুদন দত্ত। এখানে
আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার যোগ্য। প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক বলে স্বীকৃত 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' (উভয়েরই প্রক
াশকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) কোন পাদপ্রদীপের আলোয় হাজির হতে পারেনি। তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, এ পর্বের প্রথম
পঁচিশ বছর প্রযোজিত নাটকের সংখ্যা মাত্র দুই।

আসলে নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে কলকাতার বনেদি বাবুরা গোড়ার দিকে তেমন সচেতন হয়ে ওঠেননি। এ বিষয়ে আগ্রহ
দেখা দিয়ে ছিল গত শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন যখন থেকে সম
াজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে শু করেছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' তো এরই প্রত্যক্ষ ফসল বলে গণ্য হতে
পারে। তাছাড়া উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের প্রধানতম লক্ষণ ছিল নারীকেন্দ্রিক ভাবনা। রামমোহন রায়ের সতীদ
াহ প্রথার বিলোপ প্রচেষ্টা থেকে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, কুলীনদের বহুবিবাহের রীতির বিদ্ধতা, স্ত্রীশিক্ষার
বিস্তার প্রভৃতি তারই প্রতিফলন। মধুসুদনের প্রহসন ব্যতীত প্রথম তিনটি নাটকের নামকরণ শুধু যে তিনটি রমণী চরিত্রকে

অবলম্বন করেছে তাই নয়, এ নাটকগুলির মুখ্য ক্রিয়াও আবর্তিত হয়েছে শমিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী, এই তিন রমণীকে ঘিরেই। শুধু নাটকেই বা কেন, বীরাঙ্গণা কাব্য অথবা 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুটির নামের মধ্যেও রয়ে গেছে এ মনস্তত্ত্বের স্বাক্ষর । 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক' ও নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল।

--- চার --

তবু এসব প্রযোজনা ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত। বেশির ভাগ বাড়িতেই এক অথবা দু'রাতের বেশি অভিনয় হতে দেখা য ায়নি। শুধুমাত্র 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৮), 'পাথুরিয়াঘাট বঙ্গ রঙ্গালয়' (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৯) এবং 'জোড়াসঁ াকো থিয়েটার' (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৫) নাটক প্রযোজনা করেছিল বেশ কয়েকবার । আসলে উদ্দীপনায় গভীরতার অভাব এবং প্রযোজনার খরচের প্রাচুর্য প্রাথমিক উৎসাহকে অচিরেই সীমিত করে তুলত। কখনও কখনও অন্যতম কর্মকর্তার মৃত্যুও ন াট্যশালায় দরজা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে।

খরচের প্রসঙ্গটি অবশ্যই ছিল অন্যতম। নবীনচন্দ্র বসুর একটি প্রযোজনার খরচ সে আমলে লক্ষাধিক টাকায় ঠেকেছিল এবং দায় মেটাতে তিনি সাহেব পাড়ায় একটি বাড়ি বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। নায়িকা সেজে লাখ টাকা দামের গহনা পরে মঞ্চে ওঠা না হয় তেমন খরচ নয় কেননা অভিনয় শেষে ঘরের গহনা ঘরেই ফিরেছিল বলে ধরা যায়। কিন্তু প্রতিদিনের মহলার জন্যই শুধু হাজার হাজার টাকা খরচ হলে নাটক মঞ্চস্থ হবার দিনগুলিতে খরচের পরিসীমা না থাক ারই কথা। প্রযোজনার বহুবিধ খরচের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা এসব থিয়েটারের নিয়মিত দর্শকদের মধ্যে হাজির থাকতেন কোম্পানির বেশ কিছু সাহেব - মেম । তাদের আপ্যায়নের খরচ স্বভাবতই কম ছিল না।

শুধু যে নাট্য প্রযোজনার জন্য ব্যয় করা হত তা তো নয়। প্রতিযোগিতার ফসল হিসেবে রচিত হত যেসব নাটক তাদের পুরস্কার মূল্য তো ছিলই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নাটক ছাপানোর খরচ। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'রত্নাবলী' অথবা 'শর্মিষ্ঠার' ইংরেজি অনুবাদ শুধু নিজেদের খরচে ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেননি, প্রকাশ করার ভার নিয়েছিলেন মধুসূদনের নাট্যকর্ম সমুহেরও। অবশ্য নাট্যশালার অকালবিয়োগে তার সবটা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি।

সাহেবেরা এসব থিয়েটারে শুধু যে দর্শক হিসেবে হাজির থাকতেন তা নয়, উদ্যেক্তাদের অনুরোধে লিপ্ত হতেন সক্রিয় সহযোগিতায়। অবশ্যই উপযুক্ত সম্মানমূল্যের বিনিময়ে। প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িতছিলেন হে ারেস হেম্যন উইলসন। সেকালের খ্যাতনামা সংস্কৃত ভাষাবিদ ছিলেন তিনি, এ থিয়েটারের জন্য অনুবাদ করে দিয়েছিলেন 'উত্তররাম চরিত' নাটকের কিছু অংশ। পরবর্তীকালেও পাওয়া যায় বিবিধ থিয়েটারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন মি. ব্য ারী, মি. ক্লিংগার, মি. পার্কার, মি. রবার্টস প্রমুখ সাহেব পাড়ার নাট্যব্যক্তিত্ব। এঁরা সকলেই তখন যুক্ত ছিলেন কোনও ইংরেজি থিয়েটারের সঙ্গে । মি. রবার্টস ছিলেন চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত, মি. পার্কারের যোগ সাঁ থিয়েটারের সঙ্গে। এঁদের সংলগ্নতা বাংলার নাট্য প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করেছিল এমন অনুমানও অসঙ্গতনয়।

প্রযোজনার তেমন ধারাবাহিকতা না থাকলেও এ সব প্রচেষ্টা অবশ্যই বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল অন্তত অভিনয়ের দিক থেকে। বিদ্যুতের আবির্ভাব তখনও ঘটেনি, আলোকসম্পাত তাই তেমন অর্থপূর্ণ হত না। মঞ্চসজ্জায়ও ছিল পারস্পেকটিভের অভাব। কিন্তু এসব অনুপস্থিতি ঘুচিয়ে দিত অভিনেতাদের পারঙ্গমতা। নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেত্রীদের যুক্ত করা হলেও পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর বাংলা মঞ্চে দেখা যায়নি মহিলাদের । পুষরাই তখন অভিনয় করতেন মহিলাদের ভূমিকায় । কিন্তু এ দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যেত সক্ষম অভিনেতাদের কুশলী প্রকাশে । এ সময়েই অন্য অনেকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্বয়ং কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যাঁকে মধুসুদন অভিহিত করেছিলেন 'বাংলার গ্যারিক'বলে।

এ পর্বের থিয়েটারের আর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়েও বলা যেতে পারে কিছু কথা । এ সব থিয়েটারে দর্শকরা থাকতেন অ
ামন্ত্রিত, প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। সাধারণভাবে দর্শক চিকে খুশি করার দায় থাকত না উদ্যেত্তাদের। তাই নাট্য
রচনার ক্ষেত্রে চলিত চির কাছে সব সময়ে আত্মসমর্পণের প্র্ন ছিল না। কিন্তু অভিনয় অনিয়মিত হবার দণ নাটক রচনা
সীমিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই ১৮৩১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত বাংলা নাটকের সংখ্যা সামান্যই। শুধুমাত্র পাঠের জন্য ন
াটক রচনা কোনওকালেই বেশি হতে পারে না। এ পর্বের নাটককারদের মধ্যে তাই উল্লেখযোগ্য হলেন রামনারায়ণ
তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। অন্যান্য নাটককারদের এখন আর ইতিহাসের পাতার বাইরে
অস্তিত্ব নেই। এমনকী রামনারায়ণ ও মনোমোহনও প্রায় বিস্মৃত।

-- পাঁচ --

বাবু থিয়েটারের পরিধির বাইরে নাটককার হিসেবে অবির্ভূত হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। এঁদের মধ্যে অ
াবার মনোমোহন বসু একটি নাট্যশালার সঙ্গে সত্রিয়ভাবে জড়িত থাকলেও দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে এমন কথা বলা যায় না।
দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রিঃ) লেখা হয়েছিল পুরোপুরি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। সমকালীন নীলকর
সাহেবদের সীমাহীন অত্যাচার বাঙালি চাষীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, তারাই প্রতিবাদভাষা পেয়েছিল দীনবন্ধুর এ ন
াটকে। তাঁর 'সধবার একাদশী'ও পায়নি আাগামি কোনও নাট্যশালার তাগিদে। অবশ্য পরবর্তীকালে এ দুটি রচনাই মঞ্চে
ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। প্রসঙ্গত তাঁর 'লীলাবতী'র কথাও বলা যায় এখানে।

মনোমোহন বসুর নাট্যরচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল হিন্দুমেলা (১৮৬৬ খ্রিঃ)। বাঙালি ঐতিহ্যের উৎসে ফেরা ছিল তাঁর
এষণা। তাই তাঁর নাটকেই প্রথম লক্ষ্য করা যায় পুরাণের কাহিনী নিয়ে ভক্তিরসের অবতারণা, যাত্রার আঙ্গিক
অনুসরণের প্রবণতা এবং গীতিবহুলতা। সে হিসেবে তাঁর 'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়' স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। কিন্তু সমকালে
বাংলা থিয়েটারের একটি প্রধান ধারা হয়ে দেখা দিয়েছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' পরে যার নাম হয়েছিল 'শ্য
ামবাজার নাট্য সমাজ'। এ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে তণ সম্প্রদায় তাঁরাই পরবর্তীতে দীর্ঘকাল শাসন করেছিলেন ব
াংলা থিয়েটারকে। তাঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর এবং আরও সব সমর্থ প্রতিভা। দীনবন্ধুর 'সধবার
একাদশী' ও 'লীলাবতী' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে বাংলা থিয়েটার সম্পৃক্ত হল মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে। এসব অভিনয় সাড়া
ফেলে দিল বিদগ্ধ মহলেও। দীনবন্ধু পরিচিত হলেন মধ্যবিত্ত বাঙলির অন্তরঙ্গ নাটককার হিসেবে।

'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্য এসব তণদের মনে প্রত্যয় জোগাল আরও বড় মাপের প্রযোজনার
জন্য। তাই তাঁরা অনেকেই পেলেন 'নীলদর্পণ' নাটককে পেশাদারীভাবে মঞ্চস্থ করার প্রেরণা। পেশাদার বলতে অবশ্য শুধু
টিকিট বিক্রি করে প্রযোজনার খরচ মেটানো এবং দরকার হলে কোনও কোনও শিল্পীকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা জোগ
ানো। সে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার। তার প্রথম প্রযোজনা হল 'নীলদর্পণ' যার প্রথম অভিনয়ের তারিখ
১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর। শু হল বাংলা থিয়েটারের নতুন অধ্যায়। গিরিশচন্দ্রঅবশ্য এ প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত
ছিলেন না। কিছু আপত্তি তুলে তিনি বিযুক্ত রাখলেন নিজেকে। তবু 'নীলদর্পণ' প্রযোজনা সাড়া ফেলে কলকাতায়। বিবিধ
গুণীজনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' অবশ্য টিকে ছিল না বেশিদিন। দল ভেঙ্গে গেল অভ্যন্তরীণ কলহে। কিন্তু 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র মধ্য
দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল যে প্রাণনা, তার অভিঘাত বহমান হয়ে রইল দীর্ঘকাল ধরে।

-- ছয় --

বাংলা থিয়েটারে পেশাদারী পর্যায় শু হবার গোড়ার কয়েক বছর তার চারণায় ছিল খানিক চঞ্চলতা এবং হয়ত কিছু
অনিশ্চয়তাও। কিন্তু সত্তরের দশকে 'বেঙ্গল থিয়েটার' এবং আশির দশকে 'স্টার থিয়েটার'তাকে ত্রমে করে তুলল দৃঢ়মূল।
মাঝে অবশ্য দেখা দিয়েছিল আরও কিছু থিয়েটার যাদের মধ্যে রয়েছে 'ন্যাশনাল' নামাশ্রিত কয়েকটি দল। সত্তরের
দশকে পেশাদারী থিয়েটার তেমন বাণিজ্য মুখ্য হয়ে ওঠেনি। আশির দশকে যখন দেখা দিলেনগুরমুখ রায়, প্রতাপ জহুরী
প্রমুখ ব্যবসায়ী, থিয়েটারে খাটতে লাগল পুঁজি, তখন বাংলা থিয়েটারের গুণগত বদল ঘটে গেল। তারই পরিণতিতে 'ব

াংলা থিয়েটারের জনক' গিরিশচন্দ্র বেসরকারি চাকরি ছেড়ে বিবিধ বোনাস ও মাসিক অর্থমূল্যের চুক্তিতে হলেন থিয়েট ারের সর্বক্ষণের কর্মী । তঁরি পথ অনুসরণ করলেন বেশ কিছু অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

বাংলা থিয়েটারে পেশাদারিত্বের প্রবর্তনায় যেসব বদল ঘটল তাদের মধ্যে প্রধান হল ধারাবাহিকতা। নাট্য প্রযোজনা নিয়মিত হল। দেখা দিল বেশ কিছু নাট্যদল। সেকালের মঞ্চে একই নাটকের অভিনয় বেশি দিন চালানো হত না। তাই দেখা দিল নাটকের বিপুল চাহিদা। ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা শুর সময়ে বাংলা নাটক ছিল খুব কম। আগেই বলা হয়েছে নাটককার হিসেবে তখন নাম ছিল শুধু রামনারায়ণ, মধূসুদন, দীনবন্ধু ও মনোমোহনের। তাঁদের নাটকের সংখ্যা ছিল সামান্যই। মধূসুদন ও দীনবন্ধু প্রয়াত হন ১৮৭৩ সালে অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার এক বছরের মধ্যেই । মনোমোহন বাংলা থিয়েটারের মূল ধারার সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং রামনারায়ণ নতুন সময়ের সঙ্গে ম ানিয়ে চলতে অসমর্থ হলেন। নাটককার ও নাটকের অভাবে তাই নাট্যশালা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের আশ্রয় নিল বটে, কিন্তু তাদের নাট্যরূপও দ্রুত বিবর্ণ হয়ে এল। নাটক লিখতে শু করলেনজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু এবং আরও কেউ কেউ, তবু বিপুল চাহিদার তুলনায় তা স্বল্প বলেই চিহ্নিত হল। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও চাওয়া হল উপযে াগী নাটক, সে আবেদনও হল ব্যর্থ। তখন প্রায় বাধ্য হয়েই নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তাঁর লেখা প্রথম ন াটক 'আগমনী' গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৭৭ সালের ৬ অক্টোবর। তবু নাট্য রচনা নিয়ে তিনি ছিলেন দ্বিধান্বিত। অবশ্য এর আগে কোনও কোনও যাত্রাদলেরজন্য তিনি লিখে দিয়েছেন গান। তাঁর নিয়মিত নাট্যরচনা শু হল ১৮৮১ সাল থেকে যখন তাঁর বযস সাঁইত্রিশ। প্রসঙ্গত বলা যায় তাঁর চেয়ে সতেরো বছরের ছোট রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম মঞ্চ নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' উপস্থাপিতকরেছিলেন ১৮৮১ সালেই।

গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার পাশাপাশি আবির্ভূত হলেন আরও বেশ কিছু নাটককার। রাজকৃষ্ণ রায় অথবা অতুলকৃষ্ণ মিত্রের আত্মপ্রকাশ গিরিশচন্দ্রের আগে ঘটলেও তাঁরা বিকশিত হলেন আশির দশকে এসে । অমৃতলাল বসুর নাটককার হিসেবে প্রতিষ্ঠাও এ সময়ে। কিছুকাল পরে আবির্ভূত হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বাইরে থেকেও তাঁরা নাটককে ফলবান করে তুললেন। সাহিত্যের এ শাখাটি অন্তত সংখ্যার দিক থেকেও আয়ত্ত করল প্রাচুর্য।

প্রযোজনার সংখ্যাধিক্য স্বভাবতই চাহিদা বাড়িয়ে দিল অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলালপ্রভৃতি অভিনেতারা তো ছিলেনই, এলেন অমৃতলাল মিত্র, বেলবাবু, দানীবাবু এবং আর ও অনেকে। এলেন অভিনেত্রীরা। বাংলা মঞ্চে দীর্ঘকাল পরে দেখা দিলেন মহিলা শিল্পীরা। 'বেঙ্গল থিয়েটার' এই সংঘটনার প্রবর্তক। এ থিয়েটারেই পেশাদারী ভিত্তিতে যুক্ত হলেন চারজন অভিনেত্রী। তাঁরা হলেন জগত্তারণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা। গোলাপসুন্দরী পরে পরিচিত হন সুকুমারী নামে। 'অপূর্ব সতী' নামে একটি নাটকও লিখেছিলেন তিনি। তবু সে আরও পরের কথা। সমাজের এক অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অভিনেত্রীরা পাকা জায়গা করে নিলেন থিয়েটারে। এবিষয়ে আপত্তি উঠেছিল। এমনকী থিয়েটারের ভেতরের মহল থেকেও । অন্য অনেকের মধ্যে গোড়ার সময়ে বিরোধী ছিলেন মনোমোহন বসু। বেশ কয়েক বছর পর আপত্তি উঠেছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের তরফ থেকেও। কিন্তু তখনবাংলা মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়ে গেছে, বিনোদিনীর অভিনয় - প্রতিভা ততদিনে বাঙালি দর্শক ও বুধজদের মাতিয়ে অপসৃত হয়েছে। তাঁর অভিনয় দেখার জন্য স াধারণ রঙ্গালয়ের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগমনও ছিলএকটি ঐতিহাসিক ঘটনা

বাংলা নাট্যশালাকে গিরিশচন্দ্র ও সহশিল্পীর দল বর্ণময় করে তুলেছিলেন অভিনয় ও সংগীতের মধ্যে দিয়ে। মঞ্চের এই সুসংগতি গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সমবেত শিল্পিত শ্রমের মিলিত ফসল। কিন্তু বাংলা নাটকে কয়েকটি নির্দিষ্ট রীতি এনেছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রায় একার প্রচেষ্টায়। বাংলা নাটকের শ্রেণীবিন্যাসে নির্দিষ্টতা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই রচনাকে অবলম্বন করে বাংলা নাটকে প্রথম দেখা দিল পাঁচটি নির্দিষ্ট ধরন। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা হল ঐতিহা

সিক নাটক যার মূল অবলম্বন ছিল দেশপ্রেম, পুরাণের গল্প ভক্তিরসে জরিত হয়ে পরিণত হল পৌরাণিক নাটকে, সামাজিক কিছু কুপ্রথাকে তুলে ধরল তাঁর সামাজিক নাটক, প্রহসনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হল সমাজের প্রতি বিদ্রূপ এবং নাচ গানে মুখরিত হল গীতিনাট্য ও পঞ্চরং। এ সবগুলো শ্রেণীরই যে প্রর্বতনাঘটেছিল তাঁর হাতে তা নয় অবশ্যই । ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রহসনে অমৃতলাল নিশ্চয়ই কৃতিত্বের দাবিদার, তবু গিরিশচন্দ্রকেই বলা যায় সর্ব রীতির সমন্বয়কারী এবং পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের শ্রেষ্ঠ কলাকার। সামান্য কিছু ব্যত্যয় সত্ত্বেও বাংলা পেশাদার নাট্যশালায় আশ্রয়ে বাংলা নাটকের এ চেহারা বজায় ছিল শিশির ভাদুড়ীর আমল পর্যন্ত।

--- সাত ---

গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের হাতে যে নাট্যাদর্শ গড়ে উঠেছিল তাতে কলকাতার সমকালীন বাঙালি দর্শকের অবদানও নেহাৎ কম ছিল না। নাটককার অভিনেতৃ সম্পদায় ও দর্শক সমাজের সুসমঞ্জস সহযোগিতাতেই গড়ে উঠতেপারে একটি সংহত নাট্য প্রযোজনা। সেকালের বাঙালি সমাজের আর্থিক মানচিত্র বিশ্লেষন করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে উনিশ শতকের উপান্তে বাংলা থিয়েটারের দর্শক ছিলেন প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁরা ছিলেন মূলত চাকরিজীবী, মধ্যসত্ত্বভোগী ও কিছু স্বাধীন বৃত্তিধারী মানুষ।

মধ্যবিত্ত বলা হবে কাদের? পোলার্ড সাহেবের অভিমত অনুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক করেছে মূলত নবোদ্ভুত নগরবাসী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পোলার্ড সাহেব অবশ্য য়ুরোপের সমাজবিন্যাসকে ব্যাখ্যা করতেগিয়েই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। শিল্প ও বাণিজ্যে বিকাশ ছাড়া এ ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ও অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও বিস্তার ঘটেনি, সেখানে রেনেসাঁসের পুর্ণতাও আসে নি। রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দায়িত্ব ও গুত্ব অত্যন্ত বেশি। উনিশ শতকীয় বাংলার রেনেসাঁস নবোদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন প্রক্রিয়ারই ফসল---এ সিদ্ধান্ত তো ঐতিহাকিদেরই।

কিন্তু আলোচনায় সতর্কতার দরকারও এখানেই। আমাদের নবজাগৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের কিছু মিল থাকলেও পার্থক্যও ছিল প্রচুর । যুগের উপযোগী মানবতাবোধ, অন্ধপ্রথানুগত্যের বিরোধিতা, স্ত্রী জাতির সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্খা ও কর্ম প্রচেষ্টায় বাঙালির জীবনে অনেক বদল ঘটিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু উনিশ শতকীয় বাঙালি বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিক কারনেই শুধু মাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের মনোযোগ ন্যস্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে জাতীয় সম্পদ বিকাশের কর্মকাণ্ডে বাঙালির শ্রম নিয়োজিত হতে পারেনি, শিল্প বিপ্লব সম্ভব তখন ছিল না এদেশে শাসক শ্রেণীরই সক্রিয় বিরোধিতায় এবং শহর ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যেও রচিত হয়েছিল দুস্তর ব্যবধান। এসব কারণেই সম্ভবত আমাদের জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অভাব। তাই নাটকের মধ্যেও ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব তেমন বিকশিত হতে পারেনি। বেশির ভাগ নাটকের ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বকে তাই মনে হয় আরোপিত ও কৃত্রিম এবং তাতে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাসের আধিক্য। ফলে নাটকের যুক্তি পরম্পরা বাcause and effect অবহেলিত থেকে গেছে। সাধাব
. ণ ‘ রঙ্গালয়ের জনক’ গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী নাটককারদের মধ্যে অন্তত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করেএ সত্যেই পৌঁছানো যায়।

অবশ্য এক্ষেত্রে একটু তর্ক তোলাও যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে বাংলা নাটক বাঙালির জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি এবং তাতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙ্গালিরই মানসিকতা। তাই তাকে পাশ্চাত্য মানদণ্ডে বিশেষ করে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা বিধেয় নয়। য়ুরোপীয় মননে প্রাধান্য পায় রজো ও তমোগুণ। তাই তাদের নাটক হয় দ্বন্দ্ব সমন্বিত । কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ নাটককার গিরিশচন্দ্র ভারতীয় আদর্শকে অনুকরণ করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সত্ত্বগুনকে, তাই তাঁর নাটক ভাবব্যঞ্জক। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার জন্য নাটকের অন্তর সত্তা আলাদা হতে পারে। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক অথবা জাপানী ‘নোহ’ বা ‘কাবুকি’ প্রতীচ্য রীতির মাপকাঠিকে অস্বীকার করেই নাটক হিসেব অতুলনীয় হয়ে

আছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে এমন কথা বোধহয় বলা যায় না। গিরিশচন্দ্রকে শুধু যে 'বাংলার শেক্সপীয়র' বলে তাঁকে পাশ্চাত্য এ নাটককারটির সঙ্গে তুলনার সুযোগ দিয়েছে তা নয়, তিনি নিজেও এ বিষয়ে আলোচন া করতে গিয়ে বলেছেন, "Dramatis" --কে সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্যপটের
ভিতর through action কথাবার্তায় সমুদয় রসও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে প্রত্যেক চরিত্রকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার করতে হয়।" আরও বলেছেন, "ঘটনার পারস্পর্যে, চরিত্রকে পরিস্ফুট করে অন্তর সংগ্রামে যে চরিত্র ফুটে ওঠে, সেটি নিপুণভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত নাটককারের কলাকৌশল।" তিনি স্বয়ং ঘোষনা করেছিলেন, "আমি শেক্সপীয়ারের নাটকের অনুকরণে নাটক রচনা করেছি। তিনিই আমার আদর্শ।" এসব কথার প্রেক্ষিতে বলা যায় গিরিশচন্দ্রের নাটক স ম্পর্কিত ধারণা অনেকটাই শেক্সপীয়ারের নাট্যরীতির আদর্শে গড়ে উঠেছিল। এতৎসত্বেও গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যান্য নাটককারেরা বাংলা নাটকে প্রতীচ্য ধরনের ত্রিয়া ওঘাত প্রতিঘাত সৃজনে তেমন সফল হতে পারেননি তাঁদের প্রতিভাহীনতার জন্য নয়, বরং সমকালের যুগ পরিবেশ ও সমাজমানসের বৈশিষ্ট্যের জন্য। মনে র াখতে হবে, তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটককারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালই ছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয়। অর্থাৎ দর্শকদের প্রশংসাধন্য। কাজেই তাঁদের নাটকের বিশেষ প্রকৃতির. স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যেমন দরকার সমকালের যুগপরিবেশের বিশ্লেষণ, তেমনি দরকার দর্শকেরও শ্রেণীচরিত্র ও প্রবণতা বিচার।

এই যে সাধারণ নাট্যশালার দর্শক --- তাঁদের চি কেমন ছিল? তাঁদের চাহিদার চেহারাটিই বা ছিল কোন্ ধরনের? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশপ্রেম, সমাজ সংস্কার এবং ভক্তিবাদ ছিল সেকালের মধ্যবিত্তের মনস্কতার মূলআশ্রয়। ন াটককারদের রচনায় প্রতিফলন ঘটেছে এ মানসিকতারই। বাঙালি মধ্যবিত্তের থিয়েটার ছিল মূলত কলকাতায় গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের থিয়েটার। তাঁদের জীবনপ্রবাহ ছিল মোটামুটি নিস্তরঙ্গ ও নিস্তেজ, দ্বন্দ্বসংঘাতবিহীন। য়ুরোপীয় জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। সেকালের ভদ্রলোকদের চি নিয়ে লিয়েবেদেভের বিরূপ মন্তব্য অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ হয়ত বা একটু একপেশে, তবু তার মূলের সত্যকে অস্বীকার করা কঠিন। গিরিশচন্দ্রের সমকালীন পত্র পত্রিকায় এ তথ্যের সমর্থনযোগ্য বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা বলছে, বাঙালির প্রিয় আমোদপ্রমে াদ হল "চুঁচুড়ার সং, নূতন যাত্রা, সখের কবিতা, গোলকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণি প্রভৃতি তিনদল নেড়ী কবির গান, মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘোড়দৌড়।" তাছাড়াও বিনোদন যোগায় "নাচগান, যাত্রা উড়িষ্যামুলুক থেকে আগত রামলীলা, আখড়া সঙ্গীত, কবির লড়াই বুলবুলাক্ষা পক্ষীর যুদ্ধ বা নাটক।" এ অবশ্য সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু আগেকার দৃশ্য কিন্তু ১২৭৯ সালের ৭ শ্রাবণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও লেখা হয়েছিল, "অধিক াংশ লোকের আমোদ প্রমোদ কালক্ষেপ ।.....বাঙালিদের বাণিজ্য প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই, আয়াসকর কর্মে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, সুতরাং বিলাসেই গাঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়াছে।" কর্ম দ্বন্দ্বহীন নিস্তরঙ্গতাই যে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনের বৈশিষ্ট্য তা সেকালেও আলোচনার বিষয় ছিল। মনে রাখতে হবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে প্রকাশিত হলেও 'সোমপ্রকাশ' মধ্যবিত্ত বাঙালির চরিত্র নির্ণয়ে খুব একটা অতিশয়োক্তি করেনি। অবশ্য এ পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা গোঁড়াছিল। তবু উদ্ধৃত মন্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার করা কঠিন। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই সেকালের দশকদের চির সঙ্কীর্ণতা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। শুধু তাই বা কেন, গিরিশচন্দ্র স্বীক ার করেছিলেন, বেশির ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে । থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আবার বঙ্গীয় নাট্যশালা বইতে লিখেছেন, "আমাদের দেশে দর্শকদের চি বলিয়া একটা পদার্থ নাই বলা যায়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ চি যখন যাহা কিছু দেখাইতেছেন, দর্শকেরা বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই দেখিয়া যাইতেছে। নাট্যশালা হইতে যে চি গড়িয়া দেওয়া হয় দর্শকেরা কেবল তাহারই অনুসরণ করে মাত্র।" দর্শকদের এ চির নির্মানে গিরিশচন্দ্রকেও দায়ী করেছিলন ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। অবশ্য ধনঞ্জয়ের এ বিষয়ে অভিমত একটু উগ্র। অ াসলে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ অথবা দর্শকদের কটুক্তি করে এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন। কেননা যে কোনও যুগেই দর্শকদের চাহিদা ও প্রবণতা এবং নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে নাট্যচি গড়ে ওঠে। এই ঘাত প্রতিঘাতেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন সময়ের বিশেষ বিশেষ নাট্য আন্দোলন। "গোগে

ালকে দর্শকদের স্তরে নামিয়ে এন না, বরং দর্শকদেরই উন্নীত কর গোগোলের স্তরে''----চেকভের এ মন্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য গোগোল যাঁদের পক্ষে অনধিগম্য তাঁদের কাছে গোগোলকে উপস্থিত করা । প্রসঙ্গত তাই মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র অনূদিত ও প্রযোজিত এবং বিদগ্ধজন প্রশংসিত 'ম্যাকবেথ' দশ রাতের বেশি চলেনি।

আসলে বঙ্গীয় নাট্যশালার কাছে সেকালের মধ্যবিত্ত দর্শকের দাবি ছিল 'নৈতিক অনুশাসন', 'সমাজ সংস্কার' ও 'দেশের হিতসাধন'। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার বছরে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, ''রঙ্গ ভূমির পুনর্জ্জীবনে আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্মনীতিরও উন্নতি হইতে পারে।'' লক্ষণীয়, 'ধর্মনীতির প্রচার' ভাল নাটকের লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'সমাজ সংস্কার' ও 'দেশের হিতসাধনের' প্রতি আকাঙ্খা। গিরিশচন্দ্র এ অনুরাগকে অস্বীকার করেননি, করতে চানওনি। তাই একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে দর্শকদের চি ও চাহিদা এবং নাটককারদের প্রবণতা ও প্রতিভা একবিন্দুতে মিলে একটি বিশেষ নাট্য আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল উনিশ শতকের কলকাতায় যার ফসল তখনকার বাংলা নাটক।

একথা ঠিক, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাটককার তাঁর সমকালীন দর্শকদের তৃপ্ত করেই কালজয়ী নাটক রচনা করে থাকেন । এলিজাবেথীয় দর্শকরা যা কিছু ভালবাসতেন, শেক্সপীয়র নিজের নাটকে সেসব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন। 'হ্যামলেট' নাটকটিকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়---- প্রেতাত্মা, হত্যা, আত্মহত্যা, তলোয়ার খেলা, মড়ার মাথা, কামানগর্জন, প্রতিশোধ, জিঘাংসা, বিষপ্রয়োগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় দর্শকের সব প্রিয় বিষয়ের প্রচুর সমাবেশ। কিন্তু তার মধ্য থেকেই শেক্সপীয়রীয় প্রতিভা মানবচরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব, অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম উপলব্ধি ও অনন্যসাধারণ কবিত্ব সহযোগে তাকে বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় করে রেখেছে। শুধু বাহ্য আড়ম্বর ও দৃশ্যময়তা তাঁর নাটককে'য়ুনিভার্সল' করে তোলেনি, বরং সমকালকে তৃপ্ত করেই তিনি শ্রেণীসীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই শেক্সপীয়র কালোত্তীর্ণ ও 'য়ুনিভার্সল'। পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রেণী সীমানা অতিক্রম করেই হতে পারেন কালোত্তীর্ণ ও 'য়ুনিভার্সাল'। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী অনুগামী নাটককাররা সমকালের দর্শকচির কাছে শুধু আত্মসমর্পণই করেছেন, 'ক্লাস লাইন' পেরিয়ে যাবার কোনও চেষ্টা তাঁদের মধ্যে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তাই তাঁদের নাটক 'য়ুনিভার্সাল' হতে পারেনি । কালোত্তীর্ণও হতে পেরেছে কি ?

--- আট ---

উনিশ শতকে বাংলা নাট্যশালাকে মূলত শাসন করেছে পেশাদারী ব্যবস্থা। অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরালে বহমান ছিল রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার । তাঁর থিয়েটার যেমন বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যলক্ষণে পেশাদার মঞ্চের বিপরীত ছিল, তেমনি বিগত যুগের সৌখিন নাট্যশালাসমূহের সঙ্গেও পৃথক। তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা তাৎক্ষণিক প্রেরণার ফসল ছিল না, তাতে ছিল ধারাবাহিকতা ও অন্বেষার গভীরতা । প্রায় বাষট্টি বছর তিনি নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন সক্রিয় নাট্যচর্চায়। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে আবির্ভাব ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ' অলীকবাবু' চরিত্রের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে । তারপর ১৮৮১খ্রিষ্টাব্দ থেকে (অর্থাৎ যে বছর গিরিশচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলেন নিয়মিত নাটককার হিসেবে) প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাঁর নাট্যকর্ম যেখানে তিনি একই সঙ্গে ছিলেন নাটককার, গীতিকার, সুরকার, প্রয়োগকর্তা এবং অধিকাংশ সময়ে মূল অভিনেতা। অথচ তাঁর নাটক প্রকৃতিগতভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলোর চাইতে একেবারেই আলাদা। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের লেখানাটকগুলোর যে শ্রেণীবিভাগ আগে করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকে অনুসরণ করেননি কখনও। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটক সম্পর্কে তাঁর বীতরাগ ছিল গভীর। বিভিন্ন সময়ের নানা মন্তব্যে তিনি কখনও তা গোপন করেননি। তাই পেশাদার মঞ্চের ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটককে মেলানো যায় না তার জন্য প্রয়োজন ভিন্নতর মনোনিবেশ।

গিরিশচন্দ্র প্রয়াত হলেন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণ ১৯১৬ তে। কিন্তু বাংলা মঞ্চের এ শূণ্যতাকে ভরিয়ে দিতে রাজকীয় আবির্ভাব ঘটল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে তিনি সৃষ্টিশীল রইলেন পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় অবশ্য দেখা গিয়েছিল নান

াধরনের উচচাবচতা কিন্তু তার থেকেও বেশি বন্ধুরতা ছিল জাতীয় জীবনে। তার পরিপ্রেক্ষিতে শিশিরকুমার ও তাঁর সহযে াগীদের অবস্থানটি বুঝে নেবার দরকার আছে।

বিশ শতকে এসে সারা পৃথিবীতেই জাতীয় সমস্যার সঙ্গে গুত্ব পেল নানাধরনের আন্তর্জাতিক সমস্যা। গোড়ার দিকে ব াংলা নাট্যসাহিত্যের প্রেরণা ছিল মূলত জাতীয়। পরিবর্তনের এ পালার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল ন া। নাটককার ও প্রযোজকরা আটকে রইলেন অতীতেই। বিরল ব্যতিত্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব সংকটও স্পষ্ট হয়ে উঠল। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ। কিন্তু সে সংকটের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অথবা সামাজিক তাৎপর্য বাংলা নাট্যজগত অনুধাবনে অক্ষম হল। এসময়েই বাঙালি মধ্যবিত্ত তথা ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার সংকটও তীব্র হয়ে উঠল। জমির উপসত্ব ভোগ আর আগের শতাব্দীর মতো চলল না । অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষাবিস্তারের ফলে চাকরির বাজারেও দেখা দিল নতুন নতুন প্রতিযোগী । 'ভদ্রলোক' শ্রেণী দান অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হল। নাটককার ও প্রযে াজকরা এ বিষয়ে তেমন অবহিত হলেন না। ইতিমধ্যে এসময়েই গান্ধীজীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন বাঙালি মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারল না। বরং সশস্ত্র যুব আন্দোলনের প্রবাহ বাঙালির কাছে অনেক বেশি আকর্ষক ছিল। এসব আলোড়ন অবশ্য নাট্যজগতকে আলোড়িতকরতে মোটামুটি ব্যর্থই হয়েছিল । এমনকী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত শ বিপ্লবও উপযুক্ত অভিঘাত জাগাতে পারেনি।

এ হেন পরিবেশে শিশিরকুমার আবির্ভুত হলেন। তিনি অবশ্য অনেক চেষ্টা করলেন। বস্তুত শিশিরযুগকে বলা যায় অভিনেতার যুগ। গিরিশযুগে বেশির ভাগ নাটককারই ছিলেন অভিনেতা। শুধুমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদই অভিনয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু শিশিরযুগেই বাংলা মঞ্চে প্রথম শিক্ষিত শ্রেণী থেকে অনেকঅভিনেতা এলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি শিশিরকুমারের আবির্ভ াবে বাংলা মঞ্চ আলোকিত হল। কিন্তু এ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও অভিনেতা যে নাটকগুলোকে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী হিসেবে পরিণত করেছিলেন, শিশিরকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েও বলতে হয়, তাদের প্রায় সবগুলোরই শিল্পমূল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাঁর প্রযোজিত ও অভিনীত বিখ্যাত নাটক 'সীতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তীব্র হলেও অযৌক্তিক নয়। আমেরিকা সফরে তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য সাংগঠনিক ত্রুটির সঙ্গে গতানুগতিকওঅবক্ষয়ী নাটকগুলোই প্রধানত দ ায়ী ছিল। যেসব নাটকের বিষয়বস্তু ও আবেদন অত্যন্ত পুরনো, পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিরকৃত্রিম ও অক্ষম অনুকরণ, তাদের প্রদর্শনে আমেরিকার সমকালীন দর্শকদের শুধুমাত্র অভিনয়কলা দিয়ে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না। শিবরাম চক্রবর্তী 'ন াচঘর' পত্রিকায় এ বিষয়ে তখন যেসব কথা লিখেছিলেন তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। বরং শিশিরকুমার যদি কিছু ধ্রুপদী ভ ারতীয় নাটক ও রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলো আমেরিকায় পরিবেশন করতেন তাহলে তা অর্থবহ হতে পারত। অ াসলে শিশিরকুমার নিজের অভিনয় ক্ষমতার উপর এত বেশি আস্থাবান ছিলেন যে নাটকের সাহিত্যমূল্যের উপর হয়ে পড়েছিলেন উদাসীন। তিনি একবার বলেছিলেন তিনিযদিরাস্তায় দাড়িয়ে বর্ণপরিচয় পাঠ করেন তাহলেও জনতা তা ভিড় করে শুনবে । এ ধরনের উক্তিতে দর্শকের উপর তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর এ প্রত্যয় কোনও নাটকক ারের যথার্থ সৃষ্টিক্ষমতাকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তাই তাঁকে জীবনের শেষদিনে এসে 'ঘুঘুবির' ও 'হালুমগীর' করার জন্য আপশোস করতে হয়। প্রযোজনায় অবশ্য তিনি এনেছিলেন নানা ধরনের পরিশীলন। 'প্রয়োগকর্তা' শব্দটি ন াট্যপ্রযোজনায় অর্থবহ হয়েউঠল শিশিরকুমারের মধ্য দিয়েই, অভিনয় পদ্ধতির মধ্যেও এসেছিল গুণগত পরিবর্তন, কিন্তু তা কোনও নাট্যআন্দোলনেপরিণত হল না। মনে রাখতে হবে নাট্যআন্দোলন হবে অথচ নতুন ধরনের নাটক তখন লেখা হবে না, এমনটাহয় না। 'নবান্ন' প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারের পালাবদল ঘটাল। তবে সে পালাবদলের চেহারা আলাদা। এখনকার গ্রুপ থিয়েটার সে ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে।